সূচি

অনুবাদকের ভূমিকা ৯

বাগ-ই-খুশি ১৯

নেই-মানুষের দেশ ১৯
মৃত সাগর ৩৩
উর্বরতার সাগর ৪৯

পাতালপাক ৯৪

ন্যাবলাস ৯৫
জেরুজালেম ১১১

স্বর্গসুখের বাগান ১৩১

কেন লিখি ১৩২
কীভাবে লিখি ১৩৯

আমি নেই ১৪৬

বাগ-ই-খুশি

১

নেই-মানুষের দেশ

যৌবন: ভারত, ১৯৪৭-১৯৬৮

যে সংস্কৃতি, সমাজ, শ্রেণি বা দেশ থেকেই আমরা আসি না কেন, আর নিজেদের যতই স্বাভাবিক, শুদ্ধ আর পরিণত ভাবি না কেন, আমরা সবাই খুনে আর বেশ্যা

—আর ডি লাইঙ্গ

পলিটিক্স অফ এক্সপেরিয়েন্স

ওই দুই জন তৎকালে (আভিসেনা যাহাদের কোরাযিন কুত্তী আর আর্মেনিয়ান কুকুর বলিয়াছেন)... এক সমাধিগহ্বরে আটক থাকিবার কারণে, একে অপরকে নিজ নিজ তীব্র বিষ আর উচন্ড রাগ লইয়া নৃশংসভাবে কামড়ায়, কিছুতেই রেহাই দেয় না... যতক্ষণ না দুইজনের দেহের প্রতিটি অঙ্গ বিষলালায় আবৃত ও গভীর ক্ষতে পরিপূর্ণ হয় আর রক্তধারা দ্বারা তাহাদের সারা দেহ প্লাবিত হয়, এবং যতক্ষণ না তাহারা একে অপরকে হত্যা করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের মৃত্যুর পরে পরিবর্তন আসে ঐ দুটি দেহে, পাপদেহ ধৌত হইয়া যায়, আদি পুণ্যদেহ ফিরিয়া আসে, এমনকি এই দেহ আরও নবীন, আরও মহান আরও সুগঠন হইয়া উঠে।

—কিমিয়াবিদ্যার এক পুঁথি থেকে

নিজের বন্ধুর কাছে কি নগ্ন হয়ে যাওয়া যায়?... যে নিজের সত্বার সব আব্রু খুলে দেয়, সে অন্যের মনে ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। তাই নগ্নতাকে ভয় পাওয়ার যুক্তি অনেক! মানুষ না হয়ে যদি দেবতা হ'তে আব্রু নিয়ে লজ্জা পেতে পারতে!

—নীটশে *দাস স্পেক জরাথ্রুস্ট্রা*

আমার মনে মায়ের প্রথম ছবি— মা আমার অসুখশয্যাঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন— কোমরছাপানো চুল, পরনে সবুজ কিমোনো। আমার জীবনের প্রথম ফোটো 'গ্র্যানি'-র কোলে। এক বয়স্কা প্রতিবেশিনী। আমার মুখ বিরক্তিতে কোঁচকানো, দু-হাত দিয়ে ঢাকা। পরনে আমার প্রিয় হলদে ছাপা জামা। (আমার মা ডিভোর্সি ছিলেন, তাই বাবা-মায়ের বিয়েতে ঠাকুরদা-ঠাকুমার মত ছিল না)। বিকেলের সোনালি রোদে ছবিটা তুলেছিলেন বাবা। আমি কোলে বসে ঠাকুরদার দাড়ি ধরে টানতাম। একবার ঠাকুরদা ঘুমিয়ে পড়ার পর ওঁর পুরোহিতের টুপি খুলে নিয়ে পরেছিলাম। আমায় জোর করে ইস্কুলে পাঠাতে চাইলে জানলার গরাদ আঁকড়ে ধরে থাকতাম। সেই জানলা এখনও আছে। ক্লাসে বসতাম আমার ঠিক ওপরের দিদির সঙ্গে। বাবা ছিলেন সুদূরের প্রাণী: ম্যালেরিয়াকালে আমার বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়া, কালো চশমা আঁটা একটি তরুণ মুখ। 'চিকিৎসার অতীত' একজিমা আমার দেহে। জন্মনাড়ি কাটার পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে রক্ত পড়া থামেনি। একবার লিঙ্গে পোকা কামড়েছিল: মা জোর করে এই 'গুহ্যকথা' ফাঁস করার পর বাবা আমায় পাঁজাকোলা করে ডাক্তারের কাছে ছোটেন। চুল ছাঁটার সময় আমার কান্না থামানোর জন্য মৌরি লজেন্স জোগাতে হত। বোর্ডিং স্কুল এত অপছন্দ ছিল যে দিনকয়েকের মধ্যেই আমায় ফেরত আনতে হয়।

আর-এক নতুন শিশুর আগমন: বাবা পুজোর থালায় কাজল, গোলাপজল, চাল, একটা রুপোর টাকা, প্রদীপ, জরথুস্ট্রের একটি ছবি, আর কালি-কলম-কাগজ রেখেছেন। সৌভাগ্যের দেবী নবজাতিকার ভাগ্য লিখবেন। আর আমি আমার বোনের ঘেরা বিছানায় বসে ওকে বোতল থেকে দুধ খাওয়াব। মা হাসপাতালে ফ্লক্স ফুলের গন্ধভরা বিছানায় শুয়ে আছেন। যখন আমরা এই খুদে মেয়ের সাথে মাকে ছেড়ে চলে এলাম, তাঁর চোখভরা দুঃখ। সারা ইস্কুলে একটিমাত্র ছেলে আমি। মা ঠিক করে দিলেন আমি যেন কক্ষনো গালাগালি আর মারামারি না করি। তাই আমি গাইতাম, নাচতাম, রাঁধতাম, সেলাই করতাম। কিন্তু সূচে সুতো পরাতে পারতাম না। ইংরেজি পড়তে ঘেন্না করতাম, ইতিহাস পড়তে ভালোবাসতাম। বাড়িতে শাড়ি পরে বোনের সঙ্গে চেরি গাছের নীচে নাচগান করতাম। বাবা-মা সেটা পছন্দ করতেন না। একদিন গলায় টিনের বাক্স বেঁধে একটা লোক এল। বাক্সের ওপরে একটা ন্যাকড়ার পুতুল, যাকে নাচানোর সুতো লোকটার পায়ের বুড়ো

আঙুলে বাঁধা। এক আনা দিলেই এই ম্যাজিক বাক্সের দুটো কাচের ঘুলঘুলির একটাতে চোখ রেখে বাচ্চারা দেখত:

দিল্লি কা দরবার দেখো
আগ্রা কা তাজমহল দেখো
কাঠপুতলি কা নাচ দেখো
বৈজয়ন্তীমালা দেখো
দেখো বাচ্চে দেখো

কিন্তু তার ছড়ার সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠনের ছবির কোনো মিল ছিল না।

সাত বছর বয়সে জরথুস্ত্রীয় ধর্মে আমার দীক্ষা হল। আমার ঠাকুরদা, মায়ের এক মাসি (আমার নিজের দিদা মরার আগে পাগল হয়ে গেছিলেন), ভগবানের একশোটি নাম। আমার ঐকান্তিক প্রার্থনার লক্ষ্য গোলাপি গালওয়ালা, সাপের মতো পাকানো গোছা গোছা সোনালি চুলের এক লোক। তাঁর মাথার পাগ আমার ঠাকুরদার মতো। আমি ইস্কুল যেতাম, ফিরতাম, রাতের খাবার খেয়ে প্রার্থনা করতাম আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ঢলে পড়তাম। জরথুস্ট্রের বিশাল অগ্নিমন্দিরে আমি শুধু তাঁর পা দুটোই দেখতে পেতাম। কোমরে পবিত্র কোমরবন্ধনী পরতাম, 'যাতে সুউচ্চ থেকে স্থূল আলাদা থাকে'।

দু-কামরার ফ্ল্যাট ছেড়ে, আমরা সাগরপারের এক বিশাল বাংলোতে উঠে গেলাম। সবুজ রঙের বাড়ি, একটি টিলার খাড়াইতে বসানো। আছে ফার্নের বাগান আর জংলি বাঁশবাগিচা। ভাটার সময় দেখতাম জল থেকে পাথর উঠে আসছে। আমি হারিয়ে যাওয়া মহাদেশের স্বপ্ন দেখতাম। দিনের পর দিন ধরে বৃষ্টি ঝরত। রাতজাগা কোকিল। জুঁইফুল। পুরোনো ঝাড়বাতি থেকে খসে খসে পড়ত পলকাটা কাচ, আমরা কুড়োতাম।

প্রতিদিন সকালে আমাদের স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বাবা শপিং সেন্টারে রোঁদে যেতেন—ফার্মাসিস্ট, লণ্ড্রী-বালা, আর স্টোরকিপারদের সঙ্গে মিষ্টালাপ করতে। সবাই বাবার গ্রেট ব্রিটেনের নাম্বারপ্লেটওয়ালা সিক্স-সিলিন্ডার মরিস গাড়ি চিনত। রোজ ঘড়িমাপা দেরি করে গয়ংগচ্ছভাবে বাবা অফিসে ঢুকতেন, চিচিংফাঁক হয়ে দরজাগুলো খুলে যেত। তারপর মিলের প্রিন্টিং, সাইজিং বা ডাইং ডিপার্টমেন্ট ঘুরে ঘুরে তিনি বাছাই করা আলসে শ্রমিকদের একে একে বধ

করতেন— চিৎকার, রাগারাগি আর গালিগালাজে টিনের ছাদ ঝনঝন করত। তারপর পেশ হত তাঁর নাস্তা: মাখনে ভাজা ডিম, কৃষ্ণমরিচস্পর্শবিহীন। মেস থেকে লাঞ্চ আসত, তারপর নীচু চেয়ারে একটু দিবানিদ্রা। এক মালিশওয়ালা রোজ এসে তাঁকে মাটি থেকে ছ-ইঞ্চি ওপরে ভাসিয়ে দিয়ে যেত। তারপর যখন তাঁর পা ভূমিস্পর্শ করত, হাঁটা হত পরম সুখের। তারপর বিশেষভাবে তৈরি শাওয়ার স্টলে চান এবং তরতাজা রুমাল আর অডিকোলন দিয়ে গর্মিশাসন। অতঃপর দরবার বসত লেবার প্রব্লেম নিয়ে, দোষিদের জুটতো থাপ্পড়। এরপর ভরে ভরে ফুল আসত কোম্পানির বাগান থেকে: কার্নেশন, ক্যানা, গোলাপ— মা সাজাবেন বৈকালিক চায়ের টেবিলে। কিন্তু বাবা অনেক খেটেখুটে পৌঁছেছিলেন এ জায়গায়। তাঁর বাবার সম্পত্তি ত্যাজ্য করে পঁচাত্তর টাকা মাসমজুরির ডাইস্টাফ ড্রাম ধোয়ার চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। আর এখন ডাইস্টাফ ডিলারদের ব্যবসা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের থেকে থোক টাকা পান।

গরমের ছুটিতে পুনে বেড়াতে গিয়ে বরোদার প্রাক্তন মহারানি চিমনাবাই গায়কোয়াড়কে দেখলাম। ওঁর ১৯৩০ মডেলের রোলস রয়েজ একটা বাঁধের পাশ দিয়ে পাঁচ মাইল পার আওয়ার গতিতে গেল। আমরা দেখলাম তাঁর নিরাবেগ, সাদা, বৃদ্ধ মুখ— লেসের মতো বলিরেখা আঁকা। তাঁর গেরাম্ভারি ভারতীয় শফার সূর্যাস্তের আগেই তাঁকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মা আমাদের বললেন, নিজের ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে বিষ খাইয়েছেন ইনি। পুরোনো প্রাসাদে গিয়ে রাজশয্যা দেখলাম। তার ওপর এক কুক্কুরী বাচ্চা বিইয়েছে। আমার মা বাবা প্রায়শই ঝগড়া করতেন। বাড়ির কাছেই রোজ এক পুলিশ দাঁড়াত, চোলাইবাজ ধরার জন্য। সে মাঝে মাঝেই মধ্যস্থতা করত। ঠাকুরদা বাবার পক্ষ নিতেন, পুরুষ যেমন পুরুষের পক্ষ নেয়। কোর্ট থেকে এক কেরানি এল, মাকে দিয়ে একটা কাগজে সই করাতে। মা কাঁদতে লাগলেন। বাবা বাড়ি ছিলেন না। ডিভোর্সের কাগজ তাঁরই পাঠানো। স্বর্গ হইতে পতন। আমাদের সিক্স সিলিন্ডারে লাদাই করে উকিলের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল। আমরা কী বেছে নিতে পারব, হয় বাবা নইলে মাকে? বাবা-মা মিটমাট করে নিলেন। মা পান্না আর গোলাপ রাখার জন্য ক্রিস্টাল কিনলেন, বাবা কিনলেন গ্রামোফোন আর ওয়াল্টজ রেকর্ড।